بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ জুলাই, ২০২৪ মোতাবেক ১২ ওয়াফা, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ অথবা (এর আরেকটি নাম) মুরাইসীর যুদ্ধের উল্লেখ করব। এই যুদ্ধ কবে হয়েছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা ইবনে ইসহাক তাবারী ও ইবনে হিশামের মতে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে হয়েছিল। কেউ কেউ এর তারিখ ৫ম হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। সহীহ্ বুখারীতে মূসা বিন উকবা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ ৪র্থ হিজরীতে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে লিখেছেন যে, এটি লেখার ভুল, ৫ম হিজরী লেখার কথা ছিল কিন্তু ভুলে ৪র্থ হিজরী লেখা হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও এই যুদ্ধ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন; তিনি বলেন, বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের তারিখ হচ্ছে ৫ম হিজরীর শাবান (মাস)। এই যুদ্ধভিযান যেহেতু খুযাআ গোত্রের একটি শাখা বনু মুস্তালিকের সাথে হয়েছিল এই জন্য একে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ বলা হয়। আর এই গোত্র একটি কূপের পাশে বসবাস করত যাকে মুরাইসী বলা হতো, এ কারণে এই যুদ্ধের আরেকটি নাম হলো মুরাইসীর যুদ্ধ। মুরাইসী মদীনা থেকে প্রায় ১১৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। বনু মুস্তালিক কুরাইশের মিত্র ছিল। তারা হাবশী নামক এক পাহাড়ের পাদদেশে যা মক্কার শহরতলিতে অবস্থিত (সেখানে) সমবেত হয়ে শপথ করেছিল যে, আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কুরাইশের সাথে থাকব এজন্য তাদেরকে হাবীশ বলতে আরম্ভ করা হয়। আর এই চুক্তির কারণেই উহুদের যুদ্ধে বনু মুস্তালিক, কুরাইশ কাফিরদের সেনাদলে অংশ নিয়েছিল। এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ এটিও ছিল যে, বনু মুস্তালিক ইসলামের শত্রুতায় ধৃষ্ট হয়ে উঠেছিল আর অনবরত তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কুরাইশ কাফিরদের সম্পূর্ণ সাহায্য ও সমর্থন তারা পাচ্ছিল। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে এবার তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাদের বিদ্রোহ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিষয় ছিল, মক্কা মুকাররমা থেকে যাওয়ার রাজপথে বনু মুস্তালিকের নিয়ন্ত্রণ ছিল। এই লোকেরা মক্কায় মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিহত করতে শক্তিশালী বৈরী ভূমিকা পালন করত। এই যুদ্ধের তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ছিল যে, বনু মুস্তালিকের নেতা হারেস বিন আবি যিরার তার জাতি ও আরববাসীদেরকে মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করে এবং মদীনা থেকে প্রায় ৯৬ মাইল দূরত্বে সৈন্যদলকে একটি স্থানে জড়ো করতে আরম্ভ করে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে এ সম্পর্কে লিখেছেন; (তিনি বলেন,) কুরাইশের বিরোধিতা প্রতিনিয়ত অতি ভয়ানক রূপ পরিগ্রহ করছিল। তারা তাদের দুষ্কৃতির মাধ্যমে আরবের অনেক গোত্রকে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করেছিল। কিন্তু এখন তাদের শত্রুতা নতুন আরেকটি আশঙ্কা সৃষ্টি করে দেয় আর সেটি ছিল, হিজাযের সেসব গোত্র যারা মুসলমানদের

সাথে সুসম্পর্ক রাখত এখন তারাও কুরাইশের নৈরাজ্যের কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিতে আরম্ভ করে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল বিখ্যাত বনু খুযাআ গোত্র, যাদের একটি শাখা বনু মুস্তালিক– মদীনার বিরুদ্ধে আক্রমণ করার প্রস্তুতি শুরু করে এবং তাদের নেতা হারেস বিন আবি যিরার এই অঞ্চলের অন্যান্য গোত্রের সাথে যোগাযোগ করে আরও কতিপয় গোত্রেকে নিজের সাথে যুক্ত করে নেয়।

বনু মুস্তালিকের এই রণপ্রস্তুতির সংবাদ যখন মহানবী (সা.) অবগত হন তখন তিনি (সা.) হযরত বুরাইদা বিন হুসায়েব আসলামী (রা.)-কে প্রেরণ করেন যেন তিনি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসেন। তিনি যাত্রা করেন এবং তাদের ঝরনার কাছে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হন। বুরাইদা (সেখানে একটি) প্রতারক জাতিকে দেখতে পান, যারা কেবলমাত্র নিজেরাই সমবেত ছিল না বরং তারা পার্শ্ববর্তী গোত্রের সৈন্যও জড়ো করে রেখেছিল। তারা হযরত বুরাইদা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? হযরত বুরাইদা বলেন, আমি তোমাদেরই একজন। আমি তোমাদের সেনাসমাবেশের সংবাদ শুনে এখানে এসেছি। এভাবে প্রজ্ঞার সাথে তাদের সকল রণপ্রস্তুতি উত্তমরূপে জরিপ করে হযরত বুরাইদা (রা.) মহানবী (সা.) সমীপে উপস্থিত হন ও তাদের অবস্থা অবহিত করেন। তিনি (সা.) মুসলমানদের ডেকে শত্রুদের সম্পর্কে সংবাদ দেন এবং ইসলামী সৈন্যদল ত্বরিত প্রস্তুত হয়ে যাত্রা করে। বনু মুস্তালিক (গোত্র) অভিমুখে তাঁর (সা.) যাত্রা করার বিশদ বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে মদীনায় তাঁর নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। ইবনে হিশাম হযরত আবু যার গিফারী (রা.)-র নাম বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত নুমায়লা বিন আবদুল্লাহ্ (রা.)-র নামও উল্লেখ করা হয়। যাহোক, এ সৈন্যদল যাত্রা করে। সাতশ সাহাবীর সমন্বয়ে (গঠিত) ছিল ইসলামী সেনাদল। মহানবী (সা.) ৫ম হিজরীর ২য় শাবান রোজ সোমবার মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হন এবং ইসলামী সেনাদলকে নিয়ে বনু মুস্তালিক অভিমুখে যাত্রা করেন। মুরাইসীর যুদ্ধে হযরত মাসঊদ বিন হুনাইদা (রা.) ছিলেন (মুসলমানদের) পথপ্রদর্শক। এই যাত্রায় মুসলমানদের কাছে সর্বমোট ত্রিশটি ঘোড়া ছিল যার মধ্যে মুহাজিরদের নিকট দশটি ঘোড়া ছিল। মহানবী (সা.)-এর দুটি ঘোড়া ছিল, **'লিযায ও যারে'**। যেসব মুহাজিরের কাছে ঘোড়া ছিল তাদের নাম নিম্নরূপ:

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত উসমান গণি (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) এবং হযরত মিকদাদ বিন আমর (রা.)। আর আনসার সাহাবীদের বিশজন অশ্বারোহীর মাঝে পনেরোজনের নাম পাওয়া যায়। যাদের মাঝে হযরত সা'দ বিন মুয়ায (রা.), হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.), হযরত আবু আবস বিন জাবর (রা.), হযরত কাতাদা বিন নু'মান (রা.), হযরত উওয়ায়েম বিন সাঈদা (রা.), হযরত মাআন বিন আদী (রা.), হযরত সা'দ বিন যায়েদ আশহালী (রা.), হযরত হারেস বিন হাযমা (রা.), হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা.), হযরত আবু কাতাদা (রা.), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.), হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ (রা.), হযরত ফারওয়া বিন আমর (রা.) এবং হযরত মুয়ায বিন রিফা বিন রাফে' (রা.)।

যাহোক, এর বিস্তারিত বিবরণে আরও উল্লেখ আছে, মহানবী (সা.)-এর সাথে অনেক মুনাফিকও রওয়ানা হয়েছিল। তারা ইতঃপূর্বে কোনো যুদ্ধের জন্য এমনভাবে বের হয় নি। আর তারা কেন বের হয়েছিল? বলা হয়, জিহাদের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না, বরং

তারা মালে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (লোভে) বের হয়েছিল। (অর্থাৎ) যদি বিজয় অর্জিত হয় তাহলে আমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাবো। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

মহানবী (সা.) যখন এ ঘটনার সংবাদ পান তখন তিনি (সা.) অতিরিক্ত সতর্কতাস্বরূপ বুরাইদা বিন হুসায়েব নামক তাঁর একজন সাহাবীকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বনু মুস্তালিকের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং তাকে জোর দিয়ে বলেন, অতি দ্রুত ফেরত এসে যেন তাঁকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত করা হয়। (কী হয়েছে, প্রকৃত অবস্থা কী– এ সম্পর্কে যেন জানান।) বুরাইদা (রা.) গিয়ে দেখেন, সত্যিই বিশাল একটি সমাবেশ এবং অত্যন্ত জোরেশোরে মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। তিনি দ্রুত ফেরত এসে মহানবী (সা.)-কে সংবাদ দেন আর তিনি (সা.) প্রথা অনুসারে আগাম পদক্ষেপ হিসেবে মুসলমানদেরকে বনু মুস্তালিকের এলাকা অভিমুখে রওয়ানা হবার আহ্বান জানান। তিনি (সা.) বলেন, তারা আক্রমণ করার পূর্বেই তোমরা প্রথমে তাদের অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যাও। আর অনেক সাহাবী তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান বরং মুনাফিকদের একটি বড়ো দলও, যারা ইতঃপূর্বে এত (বড়ো) সংখ্যায় কখনো অংশগ্রহণ করে নি, তারাও সঙ্গে রওয়ানা হয়। মহানবী (সা.) নিজের অবর্তমানে হযরত আবু যার গিফারি বা কিছু রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত যায়েদ বিন হারেসা কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে পঞ্চম হিজরী সনের শাবান মাসে মদীনা থেকে বের হন। সেনাবাহিনীতে কেবল ত্রিশটি ঘোড়া ছিল। তবে উটের সংখ্যা কিছুটা বেশি ছিল। আর সেই সমস্ত ঘোড়া ও উটের ওপরই মুসলমানেরা মিলেমিশে পালাক্রমে আরোহণ করত।

এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরও লেখেন,

পথিমধ্যে মুসলমানরা কাফিরদের একজন গুপ্তচরকে পায় যাকে পাকড়াও করে তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত করে। আর সে প্রকৃতপক্ষেই গুপ্তচর কিনা এটি যাচাই করার পর তিনি (সা.) কাফিরদের অবস্থা সর্ম্পকে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে বলতে অস্বীকার করে। আর যেহেতু তার আচরণ সন্দেহজনক ছিল তাই সেই যুগের প্রচলিত যুদ্ধনীতি অনুযায়ী হযরত উমর (রা.) তাকে হত্যা করেন। এরপর মুসলিম সেনাবাহিনী সামনের দিকে অগ্রসর হয়। বনু মুস্তালিক যখন মুসলমানদের আগমনের খবর পায় আর এই সংবাদও তাদের কাছে পৌঁছে যে, তাদের গুপ্তচর মারা গেছে– তখন তারা খুবই ভীত হয়, কেননা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল কোনোভাবে মদীনায় অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ হস্তগত করা। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর বুদ্ধিমত্তার কারণে এখন তারা লাভের পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব তারা অত্যন্ত ভয় পেয়ে যায় আর অন্যান্য গোত্র, যারা তাদের সাহায্যের জন্য তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল– তারা ঐশী হস্তক্ষেপে এমন ভয় পায় যে, দ্রুত তাদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু স্বয়ং বনু মুস্তালিককে কুরাইশরা মুসলমানের বিরুদ্ধে শত্রুতার বিষয়ে এমনভাবে মগজধোলাই করেছিল যে, তারা এরপরও যুদ্ধের ইচ্ছা থেকে বিরত হয় নি এবং পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলার জন্য উদ্যত ছিল।

মহানবী (সা.) যখন মুরাইসী পৌঁছেন তখন তাঁর (সা.) জন্য চামড়ার তাঁবু খাটানো হয়। তাঁর (সা.) পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। কিছু ইতিহাসবিদ হযরত উম্মে সালামারও উল্লেখ করেছেন যে, তিনিও হযরত আয়েশা (রা.)-র সাথে ছিলেন। কিন্তু আল্লামা ইবনে হাজর সেসব বর্ণনাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন যেগুলোতে

হযরত উম্মে সালামার সাথে থাকার কথা উল্লেখ রয়েছে। তার নিকট বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশার শব্দাবলি হলো, 'ফাখারাজা সাহমি' অর্থাৎ-লটারিতে আমার নাম আসে। একথা থেকে বুঝা যায় যে, এই যুদ্ধাভিযানে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে এককভাবে হযরত আয়েশা (রা.)-ই ছিলেন যিনি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সাথে গিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধাভিজানে মুসলমানদের সঙ্কেত কী ছিল– (সে বিষয়ে) ইবনে হিশাম লিখেছেন যে, বনু মুস্তালিকের দিন মুসলমানদের সঙ্কেত ছিল 'ইয়া মানসুরু! আমিত আমিত'। এর অর্থ হচ্ছে, হে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি! মারো, মারো! এই সঙ্কেত ব্যবহার করার (পেছনে) প্রজ্ঞা এটি ছিল যে, মুসলমান ও কাফিরদের (চেনার ক্ষেত্রে) যেন সংশয় সৃষ্টি না হয় এবং রাতের অন্ধকারেও মুসলমানরা একজন আরেকজনকে চিনতে পারে। মহানবী (সা.) সাহাবীদের সারিবদ্ধ করেন। মুহাজিরদের পতাকা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে দেওয়া হয়। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তা হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরকে দেওয়া হয়েছিল। আর আনসারদের পতাকা হযরত সা'দ বিন উবাদা-কে দেওয়া হয়। মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে নির্দেশ দেন যে, মানুষের মাঝে এই ঘোষণা করুন, অর্থাৎ শত্রু সেনাবাহিনীর সামনে এই ঘোষণা করুন যে, হে লোকসকল! বলো, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় আর এর মাধ্যমে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদকে সুরক্ষিত করে নাও। হযরত উমর (রা.) তা-ই করেন। কিন্তু মুশরিকরা অস্বীকার করে। কিছুক্ষণ তিরন্দাজি হতে থাকে। প্রথমে মুশরিকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তির নিক্ষেপ করে। আর মুসলমানরাও কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিরন্দাজি করতে থাকে। এরপর মহানবী (সা.) স্বীয় সাহাবীদের নির্দেশ দেন যে, আক্রমণ করো। তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করেন। মুশরিকদের মধ্য থেকে কেউই পালাতে পারে নি। তাদের মধ্য হতে ১০ জন নিহত হয়, বাকি সবাই বন্দি হয়। তিনি (সা.) তাদের নারী ও পুরুষ, সন্তানসন্ততি এবং গবাদিপশু বন্দি করে নেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এর বিস্তারিত বিবরণে লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) যখন মুরাইসী পৌঁছেন, যার নিকটে বনু মুস্তালিকের বসবাস ছিল এবং যেটি সমুদ্র তীরের কাছে মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি একটি জায়গার নাম, তখন তিনি (সা.) শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেন। আর সারি বিন্যাস ও পতাকা বণ্টন ইত্যাদি কাজ শেষ করার পর তিনি হযরত উমরকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন এগিয়ে গিয়ে বনু মুস্তালিকের মাঝে এই ঘোষণা করেন যে, যদি এখনও তারা ইসলামের শত্রুতা থেকে বিরত হয়, অর্থাৎ বিরোধিতা পরিত্যাগ করে আর মহানবী (সা.)-এর শাসন মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। (এখানে) ধর্ম পরিবর্তনের কথা বলা হয় নি; মহানবী (সা.)-এর শাসনকে যেন তারা মেনে নেয়– তাহলে নিরাপত্তা দেওয়া হবে আর মুসলমানরা ফেরত চলে যাবে। কিন্তু তারা কঠোরভাবে অস্বীকার করে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এমনকি লেখা আছে যে, সর্বপ্রথম তির যা এই যুদ্ধে নিক্ষেপ করা হয়েছিল– তা তাদের লোকই নিক্ষেপ করেছিল; অর্থাৎ বনু মুস্তালিকের ব্যক্তি নিক্ষেপ করেছিল। মহানবী (সা.) যখন তাদের এই অবস্থা দেখেন তখন তিনিও সাহাবীদের যুদ্ধ করার আদেশ দেন। কিছুক্ষণ উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড তিরন্দাজি হয়। এরপর মহানবী (সা.) সাহাবীদের তাৎক্ষণিক আক্রমণের নির্দেশ দেন এবং এই অতর্কিত আক্রমণের ফলে কাফিররা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলমানরা এমন দক্ষতার সাথে তাদেরকে ঘেরাও করে যে, তাদের পুরো জাতি অবরুদ্ধ হয়ে অস্ত্র সমর্পণে

বাধ্য হয়ে যায়। আর কেবল ১০জন কাফির ও ১জন মুসলমানের মৃত্যুতে এই যুদ্ধ সমাপ্ত হয় যা একটি ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করতে পারত।

আজ একজন শহীদ এবং কয়েকজন মরহুমেরও স্মৃতিচারণ করা হবে, এজন্য এই মূল খুতবা সংক্ষিপ্ত করছি। অধিকন্তু মহররমের বরাতে, যে মাস বর্তমানে আমরা অতিবাহিত করছি, দোয়ার দিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। এটি একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা, যেখানে অত্যাচার ও বর্বরতার চরম পর্যায়ের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; মহানবী (সা.)-এর দৌহিত্র এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে শহীদ করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের দুর্ভাগ্য হলো, এটি থেকে শিক্ষা নেয়ার পরিবর্তে এই অত্যাচার এখনও চলছে। মহররম মাসে শিয়া ও সুন্নীদের মাঝে নৈরাজ্য অথবা সন্ত্রাসী আক্রমণসমূহের ঘটনা বৃদ্ধি পায়। এতে উভয় পক্ষের মানুষ মারাও যায়। অধিকন্তু এই সাম্প্রদায়িকতা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনের বাসনা মুসলমান বিশ্বে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে। বরং সারা বছরই আলেমদের পক্ষ থেকেও, বিভিন্ন গোত্রের পক্ষ থেকেও এবং সরকারের পক্ষ থেকেও একে অপরের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের বহিঃপ্রকাশ করা হচ্ছে। তারা বিন্দুমাত্র বিবেকবুদ্ধি খাটায় না। কিছুটা হলেও শিক্ষা নেবার চেষ্টা করা উচিত, কিছুটা হলেও খোদার ভয় করা উচিত! আর খোদা তা'লা এই নৈরাজ্যকে নির্মূল করার জন্য স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যে ব্যবস্থা করেছেন, সেটিকে গ্রহণ করতে তারা প্রস্তুত নয়। তারা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হতেই চায় না, যেটি একমাত্র উপায় যা উম্মতকে এক উম্মতে পরিণত করার দৃশ্য দেখাতে পারে আর নৈরাজ্যসমূহ দূরীভূত করতে পারে। মুসলমানদের একতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাদের গৌরব পুনরুদ্ধার হতে পারে এই একটি মাধ্যমে। হায়, তারা যদি বুঝতো! যাহোক, এই দিনগুলোতে আহমদীদের দরূদ শরীফ পড়া এবং মুসলমানদের একতার জন্য বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার প্রতিও আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন।

যেমনটি আমি বলেছিলাম, কয়েকজন শহীদ এবং মরহুমের স্মৃতিচারণ করব; শহীদ হলেন একজন। এই শহীদের নাম **বোনজা মাহমুদ** সাহেব। তিনি টোগো-র তামানজারোর অধিবাসী ছিলেন। ২১শে জুন সন্ত্রাসীরা তার বাড়িতে ঢুকে তাকে শহীদ করে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। (মৃত্যুকালে) তার বয়স ছিল ৬৪ বছর। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি দুজন স্ত্রী এবং ১৪জন সন্তান রেখে গেছেন। জামাতের মুবাল্লিগ নাভীদ নাঈম সাহেব লেখেন,

টোগো-র উত্তরাঞ্চলের রাজধানীর নিকটে তামানজারো জামা'ত অবস্থিত। এ স্থানটি বুর্কিনাফাসো-র পার্শ্ববর্তী সীমান্তে অবস্থিত। বোনজা মাহমুদ সাহেব এই জামা'তের প্রাথমিক সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। কৃষিকাজ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। সেখানেই একটি অস্থায়ী ঘর বানিয়ে থাকতেন, বর্ষাকালে স্ত্রী–সন্তানদের নিয়ে সেখানে স্থানান্তর হয়ে যেতেন। শুষ্ক মৌসুমে গ্রামে ফিরে আসতেন, যা অনেক দূরে ছিল; আবার বর্ষাকালে সেখানে চলে যেতেন। বর্তমানে তিনি তার খামারবাড়িতেই অবস্থান করছিলেন। ২১শে জুন রাত ৮টার সময় ৪জন সন্ত্রাসী তার বাড়িতে প্রবেশ করে। টর্চ লাইট জ্বালায়। তার চৌদ্দ বছর বয়স্ক ছেলে এই আলো দেখতে পায়। সে বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখে তৎক্ষণাৎ সেখানে যায় এবং দেখে যে, সন্ত্রাসীরা তার পিতাকে ঘিরে রেখেছে। এটি দেখে সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। যাহোক, এরপর সন্ত্রাসীরা মরহুমের

চিবুকের নীচের দিকে বন্দুক তাক করে গুলি করে। গুলি নাক ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে যায় এবং তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। কাজ সমাধা করার পর সন্ত্রাসীরা সেখান থেকে চলে যায় এবং বাড়ির অন্য কারও কোনো ক্ষতি করে নি। মনে হয়, তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল তাকে শহীদ করা এবং এজন্যই তারা এসেছিল। ঘটনার সংবাদ শোনার পর সেখানকার সেনাবাহিনীর সদস্যরাও এসে পৌঁছয়। বর্তমানে সরকারের ক্ষমতা (সেখানে) খুবই সীমিত। সর্বত্র সন্ত্রাসীরা দখল করে রেখেছে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা লাশ নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নেয় আর চতুর্দিক পরিদর্শন এবং নিজেদের তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর পরের দিন লাশ তার উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তর করে।

ইমাম বীলু সাহেব, যিনি এ অঞ্চলের প্রাথমিক স্থানীয় মিশনারী, তিনি বলেন, মরহুম প্রাথমিক বয়আতকারীদের একজন ছিলেন। শুরুর দিকেই তিনি বয়আত করেছিলেন। বয়আতের পর তিনি নামাযে এবং সকল জামা'তী অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। একইভাবে নিয়মিত চাঁদা প্রদান করতেও আরম্ভ করেন। তাদের হালকার মিশনারী জুদামা তাহের সাহেব বলেন, তিনি ২০০৭ সালে বয়আত গ্রহণ করেন এবং এর পর পরই রমযান মাস আরম্ভ হয়ে যায়। বর্ষাকাল ছিল। ফসলের জন্য জমি প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের কিছু মানুষ তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে আরম্ভ করে যে, এখন তো তুমি মুসলমান হয়ে গেছ। রোযা রাখবে নাকি ক্ষেতে কাজ করবে? কেননা রোযা রেখে এত পরিশ্রম তো করতে পারবে না। পক্ষান্তরে আমরা পরিশ্রম করব এবং আমাদের ফসল ভালো ফলবে। তিনি উত্তরে বলেন, আমি হৃদয় থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাই রোযা অবশ্যই রাখব আর ফসল দেবার মালিক আল্লাহ্। যতটা পরিশ্রম করতে পারব– করব। আমার ভাগ্যে যা আছে তা আমি পাবো, আল্লাহ্ আমাকে অবশ্যই দেবেন। আল্লাহ্‌র কৃপা এমন হয় যে, সে দিনগুলোতে বৃষ্টিপাতই বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি পুরো রমযান (মাসে) বৃষ্টি হয় নি। তিনিও প্রশান্তচিত্তে রোযা রাখেন। আর ঈদের ২য় দিন (থেকে) বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং সে অঞ্চলের গ্রামগুলোতে যেভাবে চাষাবাদ হয়ে থাকে সে অনুযায়ী তারা সবাই বাইরে বের হয়ে আসে এবং ক্ষেতের প্রতি মনোনিবেশ করে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও কাজ থেকে বিরত রাখেন যারা তাকে ঠাট্টাবিদ্রুপ করেছিল এবং নিজের প্রিয় বান্দাকেও ইবাদত করার সৌভাগ্য দান করেন। জামা'ত প্রতিষ্ঠার চার বছর পর কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। অআহমদীরা অনেক চেষ্টা করে যে, এই মসজিদের কী প্রয়োজন? তোমরা আমাদের মসজিদে নামায পড়ো। কিন্তু তিনি বলেন, আমরা (অবশ্যই) আমাদের মসজিদ নির্মাণ করব। আর মসজিদ নির্মাণের পর যখনই তিনি গ্রামে অবস্থান করতেন, নিয়মিত মসজিদে এসে পাঁচবেলার নামায পড়তেন। তার বড়ো ভাই ইয়াকুব সাহেব বলেন, সে খুবই কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিল। কখনো কারো ক্ষতি চাইত না। পরিবারের কোনো সমস্যার সমাধান কেউ করতে না পারলে তার কাছে আসত আর তিনি খুব সহজেই তা সমাধান করে দিতেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, আর তার সন্তান ও বংশধরদেরও তার পুণ্যকর্মগুলো ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা এসব অঞ্চলের সন্ত্রাস নির্মূল করুন এবং সেখান শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করুন। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে মানুষজন বলে যে, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ঝগড়াবিবাদ হচ্ছে এর কারণ। অথবা মুসলমানদের একটা শ্রেণি সেখানে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু এর পেছনেও রয়েছে পরাশক্তিগুলো যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে এসব দেশে সন্ত্রাসকে উস্কে দেয়। আবার নিজেরাই শান্তি

প্রতিষ্ঠার বিবৃতি দিয়ে সহমর্মী সাজারও চেষ্টা করে। এসব লোক যদি তাদের (অর্থাৎ সন্ত্রাসীর) পৃষ্ঠপোষকতা না করে তাহলে এসব সংগঠনের অস্তিত্বই থাকত না। মুসলমানরা বিবেকবুদ্ধি খাটাচ্ছে না যে, আমরা কী করছি! কোনো কোনো মুসলমান সংগঠন রয়েছে, কিছু রাজনীতিবিদও আছে যারা সন্ত্রাসীদের সাথে যুক্ত রয়েছে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ জনাব রশীদ আহমদ সাহেবের, যিনি সাবেক মুয়াভিন নাযের উমূরে আমা, তিনি নূর হোসেইন সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি ৮৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মগত আহমদী ছিলেন। তাদের বংশে তার পিতা নূর হোসেইন সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সূচনা হয় যিনি ১৯২৪ সালে দ্বিতীয় খলীফার যুগে বয়আত করে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। রশীদ সাহেব কাদিয়ানে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। পাকিস্তান গঠিত হবার পর মেট্রিক পাশ করে তিনি জামা'তের সেবা করতে আরম্ভ করেন। ১৯৯৮ সালে যদিও তিনি অবসরে যান কিন্তু পুনর্নিয়োগ করা হয় এবং তিনি ২০২১ সাল পর্যন্ত যতদিন সুস্থ ছিলেন সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। মরহুম সর্বমোট প্রায় ৬৫ বছর জামা'তের সেবা করেছেন। (তিনি) অসংখ্য গুণের অধিকারী ছিলেন। দিনের কাজ দিনে করতে অভ্যস্ত ছিলেন। জামা'তের একান্ত বিশ্বস্ত এবং দায়িত্বশীল হবার পাশাপাশি সকল জামা'তী বিষয় গোপনীয়তা রক্ষা করে পালন করতেন। সময়ানুবর্তিতা ছিল (তার) উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মূসী ছিলেন। চাঁদা প্রদানের বিষয়ে খুবই সচেতন থাকতেন। প্রথম সুযোগেই চাঁদা প্রদান করতেন। জামা'তের প্রতিটি তাহরীকে অংশগ্রহণের চেষ্টা করতেন। আত্মীয়স্বজনদের সাথে আপনজনের সম্পর্ক রাখতেন। অভাবীদের গোপনে সাহায্য করতেন। খিলাফতের সাথে তার গভীর ভালোবাসা এবং বিশেষ সম্পর্ক ছিল। দ্বিতীয় খিলাফত থেকে আরম্ভ করে পঞ্চম খিলাফত পর্যন্ত সব যুগেই তিনি সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন এবং পরম বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। নীরব কর্মী এবং একজন নিঃস্বার্থ সেবক ছিলেন। ১৯৭৪ এবং ১৯৮৪ সালের উত্তাল যুগে তিনি বীরত্বের সাথে বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলা করার তৌফিক পেয়েছেন। ৭৪ সালের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং গ্রেফতার করে পুলিশ তাকে বাসে করে ফয়সালাবাদে নিয়ে যাচ্ছিল। (পথিমধ্যে) চিনিউটে প্রতিপক্ষের লোকেরা সেই বাসের ওপর আক্রমণ করে, যাতে করে তাকে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশ এবং বাসের অন্যান্য যাত্রীরা পালিয়ে যায়। পুলিশরাও তাকে ফেলে পালিয়ে যায়। পুলিশ তাকে হাতকড়া পড়িয়ে রেখেছিল। হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা তাকে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর আহত করে; অলৌকিকভাবে প্রাণরক্ষা হয়। কয়েক মাস হাসপাতালে ছিলেন। এরপর পুনরায় জেলে স্থানান্তর করা হয়। এ ঘটনায় তার কয়েকটি আঙুলও কেটে গিয়েছিল, মুখেও আঘাত লেগেছিল, দীর্ঘদিন কথা বলাও তার জন্য কষ্টকর ছিল। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রাণ রক্ষা করেছেন।

১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাবওয়াতে খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এবং অন্যান্য কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়, এর মধ্যে রশীদ আহমদ সাহেবের নামও ছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই মামলা চলমান ছিল। ১৯৮৭ সালে রশীদ সাহেবের সাথে জামা'তের অন্য তিনজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও রাবওয়ার পুলিশ স্টেশনে আরও একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং কয়েক বছর পর্যন্ত তাকে বিভিন্ন আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। তার মেয়ে আমাতুস সবূর বলেন, আমার বাবা নিয়মিত বাজামা'ত নামায

পড়তেন, বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের বিষয়ে যত্নশীল, অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করতেন। কয়েকবার এমন হয়েছে যে, শুধুমাত্র বিবাদ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিজের অধিকারও ছেড়ে দিয়েছেন। তার মেয়ে আরও বলেছে, মায়ের মৃত্যুর পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আমি তার কাছে চলে যাব; [আর (সে) নিজ সন্তানদের নিয়ে তার কাছে চলে আসে।] আসার সাথে সাথেই তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, যদি আমার কাছে থাকতে চাও তাহলে সন্তানদেরকে এ বিষয়টি বুঝিয়ে দাও যে, তাদেরকে নিয়মিত বাজামা'ত নামায পড়তে হবে, জামা'তের কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে হবে, সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে না আর জামা'তের কর্মকর্তারা (কোনো কাজে) ডাকলে অপারগতা প্রকাশ করা যাবে না। (তার মেয়ে) বলেন, এই উপদেশে আমার অনেক লাভ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করুন। তার সন্তানসন্ততি এবং বংশধরদেরকেও তার সকল পুণ্যকাজ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ নায়েব নাযের উমূরে আমা জনাব চৌধুরী মতিউর রহমান সাহেবের। তিনি ছিলেন জনাব চৌধুরী আলী আকবর সাহেবের পুত্র। সম্প্রতি ৮৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। (তিনি) জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার পিতা চৌধুরী আলী আকবর সাহেবের মাধ্যমে, যিনি ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। পাকিস্তান গঠনের পর তার পিতা চৌধুরী আলী আকবর সাহেব নায়েব নাযের তালীম হিসাবে জামা'তের সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। চৌধুরী মতিউর রহমান সাহেব কাদিয়ান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পাকিস্তান গঠনের পর পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষা বিভাগের সাথে যুক্ত হয়ে যান। অবসর গ্রহণের পর তিনি নিজেকে জামা'তের সেবায় উপস্থাপন করেন। আর ২৫ বছরেরও অধিককাল যাবৎ নায়েব নাযের উমূরে আমা হিসাবে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অত্যন্ত নীরব প্রকৃতির এবং কর্মঠ মানুষ ছিলেন। চৌধুরী মতিউর রহমান সাহেব অসংখ্য গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। প্রারম্ভিক জীবনেই ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ওসীয়্যতের হিসাব-নিকাশ সবসময় হালনাগাদ রাখতেন। সময়নিষ্ঠ ছিলেন। নিয়মিত বাজামা'ত নামায পড়তেন। প্রথম সুযোগেই জামা'তের চাঁদা প্রদান করতেন। জ্ঞানচর্চার গভীর আগ্রহ রাখতেন। সরল প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কখনো তার কোনো সহকর্মীর সাথে কোনো বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হলে অর্থাৎ অপ্রীতিকর কোনো বিষয় হলে প্রথমে তিনি প্রথমে মীমাংসার হাত বাড়িয়ে দিতেন। দাপ্তরিক যে কাজই তাকে প্রদান করা হতো, তা অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতেন। কাজ পেন্ডিং কিংবা ঝুলিয়ে রাখা তিনি ভীষণ অপছন্দ করতেন আর শেষ পর্যন্ত তিনি তার এই বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছেন। দপ্তরের কাজ কখনো পেন্ডিং হতে দেন নি। মরহুম খিলাফতের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকার এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করার বিষয়ে সর্বদা উপদেশ প্রদান করতেন আর সর্বদা নিকটজনদের একথাই বলতেন। তার একমাত্র কন্যা এবং সন্তানদেরকেও সর্বদা বলতেন, **'খিলাফতের আনুগত্যের মাঝেই সকল কল্যাণ নিহিত।'**

তার স্ত্রীও কয়েক বছর পূর্বে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। তার একটি মাত্র কন্যা, যার স্বামীও মৃত্যু বরণ করেছেন। আর এই সমস্ত আঘাত তিনি একান্ত ধৈর্যের সাথে সহ্য

করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। মরহুম মজলিস আনসারুল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের সাবেক সদর চৌধুরী ইজাযুর রহমান সাহেবের চাচা ছিলেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মঞ্জুর বেগম সাহেবার যিনি সারগোধা নিবাসী মরহুম মাহমুদ আহমদ ভাট্টি সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত চৌধুরী গোলাম হোসেন সাহেব (রা.)-র পুত্রবধূ ছিলেন। তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার বড়ো চাচা চৌধুরী গোলাম নবী আলভী সাহেব এবং চাচা মুকাররম চৌধুরী আতা মুহাম্মদ আলভী সাহেবের মাধ্যমে হয়। উক্ত দুই পুণ্যাত্মা ব্যক্তি চিচাওয়াতনীতে একটি মুনাযেরা শোনার পর বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। মরহুমার পিতা চৌধুরী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আলভী সাহেব পরবর্তীতে তিন বছর গবেষণা করার পর ১৯৩৫ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তার স্বামী মরহুম মাহমুদ আহমদ ভাট্টি এবং ছেলে তাহের মাহমুদ ভাট্টি সাহেব আল্লাহ্র পথে বন্দি হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুমার এক ভাই নাসির আহমদ আলভী সাহেবকে ১৯৯১ সালে সিন্ধু এলাকা দৌর-এ আহমদীয়াতের জন্য শহীদও করা হয়েছিল। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন কন্যা ও সাতজন পুত্র সন্তান রয়েছে। তার এক পুত্র আবেদ মাহমুদ ভাট্টি সাহেব ওয়াকফে যিন্দেগী, জামা'তের মুরব্বী সিলসিলাহ এবং তানজানিয়া জামা'তে জামেয়া আহমদীয়ার প্রিন্সিপাল ও নায়েব আমীর। তিনি কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে মায়ের জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি।

সেখানকার সাবেক লাজনা প্রেসিডেন্ট কাইয়ূম সাহেবা বলেন, ১৫ বছর লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। এই সময়কালে মরহুমার মাঝে অগণিত গুণাবলি দেখেছি। তিনি নামায-রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন, পাঁচ বেলার নামায খুবই যত্নের সাথে আদায় করতেন। যতদিন লাজনাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি ছিল ততদিন নিয়মিত জুমুআর নামাযে আসতেন এবং সর্বদা প্রথম সারিতে বসতেন। এখন তো সেখানে (অর্থাৎ পাকিস্তানে) নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। মহিলারা মসজিদে যেতে পারে না, জুমুআও পড়তে পারে না আর ঈদের নামাযও না। ঘরে বসে ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষায় থাকে যে, কখন অবস্থার পরিবর্তন আসবে আর আমরা কখন মসজিদে যেতে পারব! তাদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা পাকিস্তানের লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। প্রত্যেক মিটিংয়ে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। রমযান মাসে নিয়মিত লাজনাদের সাথে মসজিদে তারাবীহর নামায পড়তেন। সর্বদা নিজের সন্তান ও তাদের সন্তানদেরও মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন। সন্তানদের উত্তম তরবিয়ত করেছেন। তাদেরকে সর্বদা জামা'তী সেবায় উদ্বুদ্ধ করতেন।

মরহুমার পুত্র কায়সার মাহমুদ ভাট্টি সাহেব লেখেন, চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা নিজের হাতখরচ থেকে নিজে চাঁদা প্রদান করতেন। ওসিয়্যতের অংশও নিজের জমানো অর্থ থেকে পরিশোধ করেছেন। আমরা তাকে জোর দিয়ে বলি যে, হিস্যায়ে জায়েদাদের অংশ আমরা পরিশোধ করে দিচ্ছি! কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে নিষেধ করে বলেন, আমি আল্লাহ্র খাতিরে ওসিয়্যত করেছি, তাই এটি পরিশোধ করা আমার দায়িত্ব। ধর্মের জন্য বিশেষ আত্মাভিমান ও আত্মসম্ভ্রমবোধ রাখতেন। ১৯৮৯ সালে তাদের গ্রামে জামা'তের অবস্থা যখন খারাপ হয় আর আহমদী বিদ্বেষীরা গ্রামের আহমদী বাড়িগুলোতে আগুন লাগাতে এবং মসজিদ দখল করে নিতে চায়, তখন তিনি তার স্বামী ও সন্তানদের বলেন যে, আপনারা

মসজিদে যান, আমি একাই ঘরের নিরাপত্তা বিধান করতে পারব। ঐ দিনগুলোতে তার পিতা, স্বামী ও সন্তানদের পুলিশ বন্দিও করেছিল আর এ কারণে কোনো অসুবিধা হয় নি। তার ছেলে বলেন যে, বরং তিনি সারা রাত কেঁদে কেঁদে এই দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমার স্বামী ও সন্তানদের জামা'তের সাথে অবিচলতার সাথে দণ্ডায়মান থাকার তৌফিক দাও। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরকেও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মুকাররম মাস্টার সা'দাত আহমদ আশরাফ সাহেবের, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-র দেহরক্ষী মুকাররম খুশি মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিরাশি বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তিন পুত্র ও তিন কন্যা রয়েছে। একজন পুত্র উসমান আহমদ তালে সাহেব সিয়েরালিওনে মুরব্বী সিলসিলা, যিনি কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে তার জানাযায় যোগদান করতে পারেন নি। মুরব্বী সিলসিলা উসমান সাহেব লেখেন, আমার পিতা পেশায় শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র তাহরীকে সাড়া দিয়ে সিন্ধুর বশীরাবাদ-এ হিজরত করেন আর তালীমুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয়ে আরবী পড়ানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সিন্ধুর বশীরাবাদ হিজরত করার পূর্বে 'পশ্চিম দারুর রহমত'-এ বসবাস করতেন। হযরত মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রা.)-র সাথে তার গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, মওলানা রাজেকী সাহেব আমার পিতাকে নিজের পালকপুত্র বলতেন আর তার পুণ্যবান স্বভাবের কারণে তার সাথে একান্ত ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি লেখেন, মৌলবি সাহেব (রা.) তার মাধ্যমে ব্যক্তিগত কাজও করিয়ে নিতেন। যখনই কেউ মওলানা রাজেকী সাহেবকে দোয়ার জন্য নযরানার টাকা দিয়ে যেত তখন আমার পিতাকে ডেকে তিনি বলতেন, এই অর্থ দারুয যিয়াফতে জমা করে দাও এবং এর রসিদ নিয়ে আসো। অর্থাৎ তা চাঁদা হিসাবে দিয়ে দিতেন। তিনি বলেন, একদিন গ্রীষ্মকালে হযরত মওলানা রাজেকী সাহেব বাসায় এসে দরজায় কড়া নাড়েন। আমার পিতা বাইরে এসে মওলানা সাহেবকে বলেন, এই প্রচণ্ড গরমে আপনার কষ্ট করে আসার কী প্রয়োজন ছিল? আপনি আমাকে ডেকে পাঠালে আমিই চলে আসতাম। তখন মৌলবি সাহেব আমার পিতাকে উত্তরে বলেন, তোমার টাকার প্রয়োজন ছিল আমাকে নিজেই বলতে পারতে। হযরত মওলানা রাজেকী সাহেব বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে, সা'দাতের অর্থের প্রয়োজন, তুমি গিয়ে তাকে টাকা দিয়ে আসো। এরপর মওলানা রাজেকী সাহেব (রা.) পকেট থেকে টাকা বের করে তাকে দিয়ে চলে যান। তারও খোদা তা'লার সাথে এরূপ সম্পর্ক ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাঁর আরেক পুণ্যবান বান্দার হৃদয়ে এই কথা সঞ্চার করেন যে, তুমি যাও আর তাকে সাহায্য করো। খিলাফতের প্রতি তার আনুগত্যের মান ঈর্ষণীয় ছিল। মুরব্বী সাহেব বলেন, কিছুকাল পূর্বে আমি ছুটি নিয়ে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য পাকিস্তানে যাই। তার শারীরিক অবস্থা দেখে আমি বললাম, আপনি সমীচীন মনে করলে আমি আরও কিছুদিন ছুটি নিয়ে নিচ্ছি। এতে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে বলেন, ভবিষ্যতে এমন কথা চিন্তাও করবে না আর তোমার মুখেও আনবে না। যুগ খলীফা তোমাকে একটি ঘাঁটিতে মোতায়েন করেছেন। সেখানেই বসে থাকো এবং জামা'তের সেবা ও সুরক্ষা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত করতে থাকো। সর্বদা ভাইবোনদের উপদেশ দিয়ে বলতেন যে,

যখনই সফরে যাও দরূদ শরীফ পড়তে থেকো, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্-র পুনরাবৃত্তি করতে থেকো।

তার একটি ঘটনা তিনি মুবাশ্বের গোন্দল সাহেবের বরাতে লিখেছেন যে, যখন তিনি বিএড পরীক্ষা দিচ্ছিলেন সে সময় আরবী পরীক্ষা খুবই কঠিন ছিল এবং কিছু প্রশ্ন সিলেবাসের বাইরে থেকে করা হয়। তিনি বলেন, আমার পিতা কিছুক্ষণ পর একটি অতিরিক্ত পৃষ্ঠা নিয়ে লিখতে থাকেন। এরপর পুনরায় আরও পৃষ্ঠা নিতে থাকেন, অর্থাৎ আরও কাগজ নিয়ে লিখতে থাকেন। তার সঙ্গীরা তাকে জিজ্ঞেস করে যে, আমরা তো মূল উত্তরপত্রই শেষ করতে পারি নি, তুমি কী লিখে যাচ্ছিলে? তখন তিনি উত্তর দেন, আমার যতটুকু উত্তর জানা ছিল সেটা তো আমি লিখে দিয়েছি। এরপর আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরবী কাসীদা 'ইয়া আইনা ফাইযিল্লাহি ওয়াল ইরফানি'-র ৭০টি পঙ্‌ক্তি ছিল তা-ও লিখে দিয়েছি যেন যে-ই তা পড়বে তার কাছে কমপক্ষে তবলীগ পৌঁছে যায়। জানি না পাশ করব কিনা, পরীক্ষক পাশ করাবেন কিনা, কমপক্ষে পঙ্‌ক্তি পড়ে তার মনে একটি রেখাপাত হবে যে, কোনো আহমদী লিখেছে অথবা কার লেখা পঙ্‌ক্তি এগুলো। আর এরপর সে খোঁজ নিবে আর এভাবে তবলীগের পথ উন্মোচিত হবে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লাও অনুগ্রহ করেন। এই পরীক্ষায় শুধু তিনজন পাশ করে আর আমার পিতা তাদের মাঝে একজন ছিলেন। তিনি বলতেন, এটা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কাসীদার কল্যাণে হয়েছে।

নফল ইত্যাদি ইবাদত এবং রোযা নিয়মিত পালন করতেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি ভালোবাসা ও তিলাওয়াতের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। তাকে সর্বদা গুনগুন করে কুরআনের বিভিন্ন সূরা পড়তে শুনেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাসীদা নিয়মিত পাঠ করতে শুনেছি। কাসীদা পাঠ করতে গিয়ে প্রায়শ তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহ পাঠ করতেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের ঘটনাবলি শুনাতেন, বিশেষ করে হযরত মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেবের ঘটনাবলি নিজ শিষ্যদের অবশ্যই শোনাতেন। তিনি উদ্যমী দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন এবং সদাপ্রস্তুত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। জামা'তের অনুষ্ঠানসমূহে নিয়মিত উৎসাহের সাথে অংশ নিতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানদেরকেও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)